International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-II, Issue-II, September 2015, Page No. 26-34
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

সুন্দরবন অঞ্চলে মৌলেদের মধু সংগ্রহের পদ্ধতি সম্পর্কিত ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও তাদের লোকবিশ্বাস-সংস্কার

অপূর্ব রায়
জুনিয়র রিসার্চ ফেলো লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ড. সুজয়কুমার মণ্ডল
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ

Abstract

Sundarban is the largest mangrove delta in the world. This Sundarban is divided in two countries, India and Bangladesh. The one third percent of the total sundarban is India. The people who live in coastal areas (nearby Sundarban) are engaged in several professions; those are honey collection, fishing, catching crabs and shrimps, cutting woods. The people, who are engaged in those professions are applying their traditional knowledge to do their job. Among those professions, the honey collection is the most important job, that is fully depending on traditional knowledge. The people, who are involved in this profession is called 'Moule' or 'Mouli'. Moules are a group of people. At first they take written permission from the forest department for honey collection. They know that they have no guarantee of returning home with their harvest of honey from the forest, because, death follows them in every step. Instead of that they go to the forest for collecting honey even though they have big risk for their lives. We will discuss every step of honey collection and about the folk beliefs of Moule community concerning this job.

Key Words: Moule, Honey Collection, Traditional Knowledge, Customs, Folk-beliefs.

ভুমিকা

নিম্ন-বঙ্গীয় অঞ্চলে গঙ্গা ও পদ্মার পলি সঞ্চয়ের ফলে যে ব-দ্বীপ গড়ে উঠেছে তা এশিয়া তথা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। আজ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্বে এর যে কি নাম ছিল তা আজ অনুমান সাপেক্ষ। যেমন ছিলনা এর নাম, তেমনি ছিলনা এর বাসযোগ্য কোন পরিবেশ। কালক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন তথা ইংরেজ আগমনের সমসাময়িক পর্যায়ে এই অঞ্চল কখনও 'চন্দ্রদ্বীপবন', কখনও 'চুনরবন', কখনও বা 'স্যান্ডারবন', আবার কখনও 'সুন্ধ্যারবন' নাম ধারণ করেছে।[১] সে যাই হোক বর্তমানে আমরা একে সুন্দরবন নামে জানি, যা আজ 'World Heritage Site'হিসেবে স্বীকৃত। বর্তমানে সুন্দরবন দুটি দেশের মধ্যে বিভক্ত। বাংলাদেশের সুন্দরবন বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতখিরা জেলার অন্তর্গত। আবার ভারতীয় সুন্দরবন পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত প্রায় উনিশটি থানা সংলগ্ন অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। ভারতীয় সুন্দরবনের অধিকাংশ অঞ্চল আজও পর্যাপ্ত পরিমাণে আধুনিকতার স্পর্শ পায়নি। এখানে এখনও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, উন্নত সড়কপথ গড়ে ওঠেনি। এখানকার অধিবাসীদের মৃত্যুর সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। এখানে না আছে পানীয় জলের ব্যবস্থা, না আছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সচেতনতা। সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবন এখানে দুর্বিসহ। নানা শ্রমজীবী মানুষের সহাবস্থান রয়েছে এই সুন্দরবন অঞ্চলে। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এই সুন্দরবনের মানুষজন কখনও চাষবাস, আবার কখনো জঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভর করে তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। যারা ভূমিহীন, যারা নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে বসবাস করে, তাদের অধিকাংশেরই জীবিকা হল মাছ ধরা, জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনা, মীন (বাগদা

চিংড়ির বাচ্চা) ধরা, কাঁকড়া ধরা, মধু সংগ্রহ করা। এমনই একটি উল্লেখযোগ্য পেশা হল মধু সংগ্রহ করা। সাধারণত যারা মধু সংগ্রহ করে, তাদেরকে মৌলে বলে। এরা বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় জঙ্গলে যায় এবং মধু সংগ্রহ করে। জীবনের পরোয়া না করেই মৌলেরা জঙ্গলে যায় এবং নিজেরাও জানে জঙ্গল থেকে তারা নাও ফিরতে পারে। তবুও জীবন-জীবিকার তাগিদে তাদের জঙ্গলে যেতে হয়, যুদ্ধ করতে হয় বাঘ, কুমির, বিষধর সাপেদের সাথে।

এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু হল মৌলে সমাজ ও তাদের লোকবিশ্বাস-সংস্কার। এদের অধিকাংশেরই জমি-জমা নেই বললেই চলে। ফলে সারা বছর জঙ্গলের মাছ, কাঁকড়ার ওপর নির্ভর করতে হয়। বছরের বিভিন্ন সময়ে জঙ্গলের ওপর নির্ভর করেই এদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল ১০৬টি দ্বীপ দ্বারা গঠিত হলেও, এদের মধ্যে ৫২টি দ্বীপে মানুষ বসবাস করতে পারে না। এই ৫২টি দ্বীপে বন্য প্রাণীরা নির্বিচারে ঘুরে বেড়ায়। এই দ্বীপগুলি বিভিন্ন প্রকার ম্যানগ্রোভ অরণ্যে পরিপূর্ণ। যে গাছগুলি এই দ্বীপগুলিতে বেশি সংখ্যায় দেখা যায় সেগুলি হল- গরান, খলসে, কাঁকড়া, হেঁতাল, বানী, সুন্দরী, গামা প্রভৃতি। এই সমস্ত উদ্ভিদ দ্বারাই সমগ্র সুন্দরবন পরিপূর্ণ। এই উদ্ভিদ গুলোতে বছরে প্রায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে ফুল ফোটে আর সেই ফুলের মধু সংগ্রহ করে মৌমাছিরা। সাধারণত ফাল্গুন মাসেই হেঁতাল গাছে ফুল ফোটে এবং তার পরেই অন্যান্য গাছগুলিতে ফুল ফুটতে দেখা যায়। যেমন আষাঢ় মাসের প্রথমদিকে খলসে ফুল ফোটে আর মৌমাছিরা এই সময় জঙ্গলে তাদের বাসা তৈরি করে এবং মধু সংগ্রহ করে চাক পরিপূর্ণ করে। সাধারণত ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ –এই তিন মাস মৌলেরা মধু সংগ্রহ করে। অন্য সময় জঙ্গলে মৌচাক থাকলেও তাতে তেমন মধু থাকে না। কারণ অন্য সময়ে জঙ্গলের কোন গাছে ফুল ফোটেনা ফলে মৌমাছিরা মধু সংগ্রহ করার পরিবর্তে বাসায় বসে মধু খেতে থাকে। এছাড়া ফাল্গুন-চৈত্র মাসে তেমন ঝড়-বৃষ্টি হয় না, ফলে মৌচাকের কোন ক্ষতি হয় না, আবার বৃষ্টি না হবার দরুণ ফুলের মধুতে জলের পরিমাণ কম থাকে ফলে মধু গাঢ় হয়। তাই ফাল্গুন, চৈত্র–এই দুই মাসই হল মৌলেদের মধু সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। বর্তমানে যারা জঙ্গলে যায়, জঙ্গল কর্তৃপক্ষ তাদের এক বিশেষ পাস বা ছাড়পত্রের ব্যবস্থা করেছে। এই পাসের সাহায্যে স্থানীয় অধিবাসীরা জঙ্গলে যাওয়ার অনুমতি পায়। যারা মধু সংগ্রহ করতে জঙ্গলে যায় তারা চৈত্র মাসের প্রথম দিকে বনবিভাগের দপ্তর থেকে পাস সংগ্রহ করে এবং প্রায় তিন মাস যাবৎ তারা জঙ্গল থেকে মধু সংগ্রহের অনুমতি পায়। তবে মধু সংগ্রহ করেই তা নিজেরা বিক্রি করতে পারে না। তাদেরকে ঐ বনবিভাগের হাতেই সংগৃহীত মধু তুলে দিতে হয়। বনবিভাগ একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ঐ সংগৃহীত মধু কিনে নেয়। যদিও সে অর্থের পরিমাণ নিতান্তই কম। তবে এক্ষেত্রে একটি সুবিধা রয়েছে যদি বৈধ পাস নিয়ে কেউ জঙ্গলে যায় এবং বাঘ ও কুমিরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যায় তবে সরকারী দপ্তর থেকে তাঁর জীবনের ক্ষতিপূরণ বাবদ দেড় থেকে দু'লক্ষ টাকা তাঁর পরিবার পেতে পারে। যারা মধু সংগ্রহ পেশার সঙ্গে যুক্ত নয়, তারাও এই সময় নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জঙ্গলে যায়। তবে এরা সাধারণত গোপনে মধু সংগ্রহ করে, এদের কাছে বৈধ পাস থাকে না।

মধু সংগ্রহের পূর্বপ্রস্তুতি

যারা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায় তারা প্রথমে বনবিভাগের দপ্তর থেকে পাশ সংগ্রহ করে। এরা দলে প্রায় ৭-৮ জন থাকে, আবার কখনও আরো বেশী লোকেরও দল তৈরি করতে দেখা যায়। তারপর শুরু হয় জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বপ্রস্তুতি। মধু সংগ্রহের জন্য মৌলেদের জঙ্গলে প্রায় ১০-১৫ দিন থাকতে হয়। তাই জঙ্গলে থাকার রসদ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণ জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বেই সংগ্রহ করে নিতে হয়। কারণ জঙ্গলের মধ্যে একবিন্দু পানীয় জলও পাওয়া যায় না। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও উপকরণ সংগ্রহ হয়ে গেলে পঞ্জিকা দেখে একটি ভালো দিন নির্বাচন করে এবং জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে মা বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। ১০-১৫ দিনের খাবার সামগ্রী বাদেও তারা সঙ্গে নেয় একটি বড় 'দা' বা 'হেসো', যা মধুর চাক কাটতে প্রয়োজন হয়। দলে যে ক'জন লোক থাকে, প্রত্যেকের জন্য ছোট অথবা মাঝারি দা থাকে, এছাড়াও সঙ্গে থাকে বড় নেট জাল, ২-৩টি হাড়ি, বালতি, বড় মোটা দড়ি, খড়, প্লাস্টিকের ড্রাম, টিনের ড্রাম, প্রত্যেকের জন্য একটি কদাকার মুখোশ, দুটি গামলা প্রভৃতি। এ সবই তাদের মধু সংগ্রহ করার সময় প্রয়োজন হয়।

মধু সংগ্রহের পদ্ধতি

মৌলেরা সাধারণত জোয়ারের জলেই গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এদের জঙ্গলের পথ-ঘাট সবই জানা থাকে, ফলে কোন পথে গেলে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো যাবে তা সহজেই নির্ধারণ করে নেয়। আবার জঙ্গলের তারতম্য অর্থাৎ এক এক জঙ্গলে এক এক রকমের উদ্ভিদ দেখা যায়। ফলে যে গাছে যখন ফুল ফোটে সেই উদ্ভিদকেন্দ্রিক জঙ্গলেই মৌলেরা

যায়। তবে গভীর জঙ্গলেই মৌমাছিরা বাসা করতে পছন্দ করে, তাই ভালো মধু পাবার জন্য মৌলেদের গভীর জঙ্গলেই যেতে হয়। প্রথমে একটি উঁচু স্থান দেখে মৌলেরা নৌকো বাঁধে। তার পর বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যায়, যেমন যারা রান্না করে ও নৌকা দেখভাল করে তারা নৌকো ছেড়ে যায় না। আর যারা মধু সংগ্রহ করতে যায় তারা প্রথমে ফুল হাতা জামা ও ফুল প্যান্ট পরে নেয়। গামছা দিয়ে চোখ দুটো বাদে পুরো মাথাটা বেঁধে নেয়। মাথার পিছনে বাঁধে সঙ্গে করে নিয়ে আসা মুখোশ, যা মৌলেদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ মুখোশ তারা হাট বা মেলা থেকে কেনে। মুখোশগুলো দেখতে সাধারণত দৈত্যাকার হয়। কালো মোটা গোঁফ, লাল মুখমণ্ডল, সাদা বড় বড় দুটো চোখ হল মুখোশগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এভাবে তাদের প্রাথমিক প্রস্তুতি সেরে নেবার পর, তারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেয়, দু'জন থাকে যারা বড় বড় গাছে উঠে মৌমাছিদের যাতায়াতের পথ লক্ষ্য করে এবং তাদের নির্দেশেই আর দু'জন সেই দিকে এগিয়ে যায়। তবে যারা গাছে উঠে মৌমাছিদের যাতায়াত লক্ষ্য করে তারা খুব বিচক্ষণ হয়। এরা জঙ্গলের পরিবেশ দেখেই বলে দিতে পারে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে মৌচাক আছে কিনা। মৌমাছি যে পথে মধু নিয়ে বাসায় ফেরে সে পথ নির্দিষ্ট থাকে। মৌমাছিগুলো মধু নিয়ে একটু নীচ থেকেই উড়তে উড়তে হঠাৎ করে নিচে নেমে জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে যায়। এইরকম যদি ১০ থেকে ১২টি মৌমাছিকে ওরা ঐ পথে যেতে দেখে তখন বুঝতে পারে যে ওর কাছাকাছি কোন মৌচাক রয়েছে। আসলে যেখানে মৌমাছিগুলি জঙ্গলের মধ্যে নেমে আসে সেখানে মৌচাক থাকে না, সেখান থেকে কিছুটা দূরে মৌচাক থাকে। তখন নিচে থাকা ব্যক্তিরা ওদের নির্দেশে সেই দিকে এগিয়ে যায় এবং আশেপাশের গাছগুলিতে খুঁজতে থাকে মৌচাক আছে কিনা। আবার কখনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে যদি কোন বড় গাছ দেখে তবে মৌলেরা সোজাসুজি সেই গাছের কাছে চলে যায়। কারণ অনেক সময় বড় গাছেই একসাথে পাঁচ-সাতটা মৌচাক থাকতে দেখা যায়। মৌলেরা আবার সব মৌচাক কাটে না। মৌচাক খুঁজে পাওয়ার পর তারা মৌচাকটিতে কটটা মধু রয়েছে তা যাচাই করে। যে মৌচাকে মধু থাকে সে মৌচাকের উপরের কোনার অংশ ফুলে থাকে। যে মৌচাক যত বেশি ফোলা হয়, তাতে তত বেশি মধু থাকে। এভাবে মৌচাক খুঁজে পাওয়ার পর জঙ্গলের বকড়া (হেঁতাল) গাছের শুকনো পাতা একসাথে জড়ো করে জঙ্গলের লতা দিয়ে বেঁধে নেয় এবং ঐ বকড়া গাছের কাঁচা পাতা শুকনো পাতার চারপাশে ঘুরিয়ে বেঁধে নেয় একে এরা 'বট' বলে। এবার ঐ বটের শুকনো হেঁতাল পাতায় আগুন জ্বালালে বাইরে থাকা কাঁচা পাতা আগুন জ্বলতে বাঁধা দেয় ফলে প্রচন্ড ধোঁয়া বের হয়। যে মৌচাক কাটবে সে সেই বট ও ধারালো দা নিয়ে গাছে উঠে গিয়ে মৌচাকে ধোঁয়া দেয়। ধোঁয়া লাগার সাথে সাথে মৌমাছিরা বাসা ছেড়ে উড়ে যায়। নিচে থাকা অন্য ব্যক্তি তখন বড় গামলা নিয়ে মৌচাক সোজাসুজি নিচে দাঁড়ায়। আবার মৌচাক যদি খুব উঁচুতে হয় তবে তাকে বালতি নিয়ে গাছে উঠতে হয়। যে ব্যক্তি ধোঁয়া দেয় সে তার সুবিধা মতো মৌপোকা উড়ে গেলে মধু কাটতে থাকে। তবে মধু সবাই কাটতে পারে না, যে মধু কাটে সে খুব দক্ষ হয়। তাকে অনেক বিষয় মাথায় রাখতে হয়, যেমন- কোন দিক থেকে ধোঁয়া দিলে তা মৌচাকের গায়ে লাগবে বা কি পরিমাণে ধোঁয়া দিলে মধু থেকে ধোঁয়ার গন্ধ আসবে না। আবার ধোঁয়া দেওয়ার সময় কীভাবে দাঁড়ালে মৌপোকা কামড়াবে না, সে বিষয়েও সতর্ক থাকতে হয়। এই প্রক্রিয়া ১০-১৫ মিনিটের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। অপর দিকে যে ব্যক্তি মৌপোকার গতিপথ দেখছিল সে ততক্ষণে অন্য কোন গাছে উঠে আবার পোকাদের গতিপথ অনুসরণ করে মৌচাকের সন্ধান করে। আর এই প্রক্রিয়া চলাকালীন যারা এই কাজে লিপ্ত থাকে তাদেরকে দু'জন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিয়ে (বালতি, দড়ি, দা, বট প্রভৃতি) সাহায্য করে ও চারিদিকে নজর রাখে। কারণ যে জঙ্গলে বেশি মৌচাক থাকে সে জঙ্গলে বাঘের সংখ্যাও বেশি থাকে। এভাবে মধু কাটা হয়ে যাবার পর মৌলেরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই স্থান ত্যাগ করে। কারণ মধুর গন্ধে মৌমাছিরা আবার ফিরে এসে তাদের আক্রমণ করতে পারে। এভাবে সকাল ৯-১০টা থেকে শুরু করে বিকেল ৩-৪টা পর্যন্ত মধু সংগ্রহ চলতে থাকে। এক একটা দ্বীপে এরা ২-৩দিনের বেশি থাকেনা। প্রতিদিন বিকেল বেলায় নৌকো নিয়ে এরা মাঝ নদীতে চলে যায়, আবার সকালে জোয়ারের জলে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে। জঙ্গলে যাবার পূর্বে ভালো মধু পাবার জন্য মা বনবিবিকে স্মরণ করে। এরা যখন মধু সংগ্রহ করে তখন অনিচ্ছাকৃত জোরে কথা বলে ও গাছ-পালায় আঘাত করে। কারণ এতে তাদের সাহস বাড়ে এবং নিজেদেরকে একটি গোষ্ঠী বলে মনে করে। যদি আশেপাশে বাঘ থেকে থাকে তবে অনেক সময় ভয় পেয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এরপর পড়ন্ত বেলায় তারা আবার তাদের নির্দিষ্ট স্থানে রাখা নৌকায় ফিরে আসে। সারা দিনের সংগৃহীত মধু সেই নৌকাতে সংরক্ষণ করে রাখে। সাথে করে নিয়ে আসা মধুরাখার পাত্র যতদিন না সম্পূর্ণ হচ্ছে, ততদিন তারা এমনি করে মধু সংগ্রহ করতে থাকে। এইভাবে মৌচাক কাটতে কাটতে যদি মধু রাখার পাত্র অল্প দিনে পূর্ণ হয়ে যায় তবে তারা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই বাড়ি ফিরে আসে।

মৌচাকের প্রকারভেদ

জঙ্গলে বিভিন্ন প্রকার মৌচাক দেখা যায়। মৌচাকের প্রকৃতি, মৌপোকাদের দেহের গড়ন ও ক্ষিপ্রতার ওপর ভিত্তি করে মৌলেরা মৌচাকগুলিকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করেছেন। যেমন-

ক. প্রজাপতি মৌচাক
খ. ভীমরুল মৌচাক
গ. ডাস মৌচাক

ক. প্রজাপতি মৌচাক: এই মৌচাকগুলি সাধারণত জঙ্গলের বড় গাছে বাসা বাঁধে। গাছের ডাল বরাবর লম্বালম্বিভাবেই এদের বাসা করতে দেখা যায়। বাসার আকৃতি অনেকটা বড় হলেও তেমন মধু হয় না। তবে বাসার যে স্থানে মধু থাকে তা অনেকটা ফুলে থাকে বা মোটা হয়ে থাকে। এই ধরনের মৌচাকে ২০-২৫কেজি পর্যন্ত মধু হতে পারে। তবে এই পোকাগুলি একটু শান্ত প্রকৃতির হয়। ধোঁয়া দেওয়ার সাথে সাথে মৌপোকাগুলি সোজা উপরে উড়ে যায়। খুব একটা কামড়ায় না। এই ধরনের বাসায় শ্রমিক মৌমাছির সংখ্যা কম থাকে এবং পুরুষ মৌমাছির সংখ্যা বেশি থাকে। পুরুষ মৌমাছিরা কখনো মধু আনতে যায় না। এরা বাসাতেই থাকে এবং প্রচুর মধু খায়, যার কারণেই এই ধরনের মৌচাকে মধু কম থাকে।

খ. ভীমরুল মৌচাক: এই মৌচাকগুলির আকৃতি অনেকটা গোলাকার। এরা গাছের ডাল থেকে শুরু করে গাছের গায়ে পর্যন্ত বাসা বানায়। সমগ্র বাসাতেই এরা মধু সঞ্চয় করে। আবার কখনো কখনো বকড়া গাছের দু-তিনটে ডালকে একসাথে নিয়ে গোল হয়ে বাসা বাঁধতে দেখা যায়। এই ধরনের মৌচাকে ভালো মধু পাওয়া যায়। তার কারণ এই ধরনের মৌচাকগুলিতে প্রচুর শ্রমিক মৌপোকা থাকে যারা শুধু মধু এনে বাসায় রাখে। তবে পোকাগুলি ভীষণ রাগি হয়। মৌলেরা যখন এই ধরনের মৌচাকের পাশে যায় তখনই মৌপোকাগুলো উড়ে এসে কামড়াতে শুরু করে। যদিও এই ধরনের মৌচাকে ভালো মধু পাওয়া যায় তবুও এই প্রকার মৌচাক কাটা মৌলেদের পক্ষে খুবই বিপদ জনক।

গ. ডাস মৌচাক: এই প্রকারের মৌচাকগুলির আকৃতি অন্যান্য মৌচাকের তুলনায় অনেক বড় হয়। মৌচাকের পোকাগুলি খুব বড় বড় ও গায়ের রং কালো হয়। এই মৌপোকাগুলি অন্যান্য মৌচাকের তুলনায় খুব হিংশ্র ও ক্ষিপ্র এবং মৌপোকাগুলির হুলে এতটাই বিষ থাকে যে ১০ থেকে ১২টি পোকা যদি কাউকে কামড়িয়ে দেয় তবে তাঁর জ্বর চলে আসে। তবুও মৌলেরা এই ধরনের মৌচাকের খোঁজ করে। এই ধরনের মৌচাকে প্রায় ৪০থেকে ৪৫কেজি পর্যন্ত মধু হতে পারে। এই মৌচাকগুলি সাধারণত শুয়ে পড়া গাছের মোটা ডালে বাসা বাঁধে এবং মৌচাকের বাসা মাটি পর্যন্ত ঝুলে পড়ে। দীর্ঘ দিন যদি এই মৌচাক কাটা না হয় তবে সমগ্র বাসাটাই মধুতে ভর্তি হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মৌলেরা এই ধরনের মৌচাকে আশাতীত মধু পায়। এই চাকগুলি যে জঙ্গলে থাকে সে জঙ্গলে বাঘকেও থাকতে দেখা যায়। কারণ বাঘ প্রায়ই ঐ সমস্ত চাক থাবা দিয়ে ভেঙে মধু খায়। এই ধরনের মৌচাকের সংখ্যা জঙ্গলে খুব কমই থাকে। তবে এই ধরনের মৌমাছিরা গভীর জঙ্গলেই ঝোপঝাড়ের মধ্যে যেখানে প্রায় সূর্যের আলো পৌঁছায় না সেখানে বাসা বাঁধতে পছন্দ করে।

মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন

জঙ্গলে প্রবেশ করার পর মৌলেদের খুবই সতর্ক থাকতে হয়। পোশাক হিসেবে ফুলহাতা জামা ও ফুলপ্যান্ট ব্যাবহার করে। পায়ে জুতো ব্যবহার করতে পারে না, কারণ জঙ্গলের ভিতরে অনেক সময় কাদায় হাটতে হয়। প্রথমে তারা একটি গামছা দিয়ে সমগ্র মুখ ও মাথা ঢেকে নেয়, শুধু চোখ দু'টো খোলা থাকে। আর একটি মুখোশ মাথার পিছনের দিকে বেধে নেয়। যখন মৌলেরা জঙ্গলে মধু কাটে তখন অনেক সময় পিছনের দিকে নজর রাখতে পারে না। ঐ মুখোশই তখন ওদেরকে বাঘের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়, কারণ বাঘ সাধারণত শিকার ধরবার সময় পিছন থেকে আড়ি করে ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে। যদি বাঘের আড়ি করবার সময় মানুষের চোখে চোখ পড়ে যায়, তাহলে বাঘ আর শিকার ধরে না। সে ধীরে ধীরে পিছনের দিকে চলে যায়। এ ক্ষেত্রে মৌলেরা তাদের এই ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে কাজে লাগায়। মৌলেদের পিছনে যে মুখোশ বাঁধা থাকে, সে মুখোশের বড় বড় লাল চোখ থাকে। যদি কখনো বাঘ মৌলেদের ধরবার জন্য পিছন থেকে আড়ি করে, তাহলে ঐ মুখোশের দিকে তাকালেই বাঘের মনে হয় সেও বাঘের দিকে বড় বড় চোখে চেয়ে আছে। তখন বাঘ শিকার না ধরে চলে যায়। জঙ্গলের মধ্য চলার সময় মৌলেদের পায়ের দিকে নজর রাখতে হয়। জঙ্গলে দু'ধরনের কাঁটা থাকে যেমন হেঁতাল গাছের কাঁটা, যা অনেকটা খেজুর গাছের কাঁটার মতো; আর একধরনের গুল্ম জাতীয় গাছ, যার পাতাতেও কাঁটা থাকে। ঐ কাঁটা গুলি পায়ে ফুটলে ভীষণ জ্বালা করে। তাছাড়া পায়ে কাদা থাকার জন্য তাদেরকে সাবধানে গাছে উঠতে হয়।

লবনাক্ত কাদা প্রচন্ড পিচ্ছিল হয়। গাছে উঠবার সময় যদি সাবধানে না ওঠে তবে পা পিছলে গিয়ে বিপদের সম্ভাবনা থাকে। আবার কখনও যদি মৌলেরা মৌচাক খুঁজতে খুঁজতে বাঘের ডেরায় পৌঁছে যায় তাহলে সমূহ বিপদ। কারণ বাঘ তখন আত্মরক্ষার জন্য আক্রমণ করে। ফলে সে দিকেও মৌলেদের খেয়াল রাখতে হয়। অথবা যদি কোন দ্বীপে বাঘে বাচ্চা দেয়, সে দ্বীপে উঠলে বিপদের সম্ভাবনা আরোও বেশি থাকে। আবার মৌচাক খুঁজতে খুঁজতে যদি তারা বেশি পরিমাণে বা স্বতেজ কোন বাঘের পায়ের ছাপ দেখে তবে আর সে দিকে যায় না। অথবা কখন যদি জঙ্গলে পচা গন্ধ পায় তাহলেও সেদিকে এগোয় না। কারণ বাঘ যেখানে বাস করে বা বাচ্চা দেয়, সেখানে থেকে প্রচন্ড পচা গন্ধ বের হয়। আবার কোন দ্বীপে যদি বাদর বা পাখির কলরব না থাকে তাহলে মৌলেরা সে দ্বীপে ওঠে না। তারা বুঝে নেয় ঐ দ্বীপে বাঘ রয়েছে, যেখানে পাখি বা বাদর থাকে সেখানে বাঘ থাকেনা। এ-বিষয়টি স্থানীয় মৌলেরা দীর্ঘ দিন ধরে পরখ করে দেখেছে। এছাড়া জঙ্গলে হাঁটার সময় ভালো করে দেখে চলতে হয়, তা না হলে অসতর্কভাবে যদি কোন গাছে বা ঝোপে নাড়া লাগে আর সেখানে যদি মৌচাক থেকে থাকে তবে হঠাৎ করে এত পরিমাণে মৌপোকা এসে কামড়াতে শুরু করে যে তখন মৌলেদের কিছু করার থাকে না। এমনই সব বিষয়গুলোর জন্য মৌলেদের খুবই সতর্ক হয়েই জঙ্গলে থাকতে হয়।

মৌলে সমাজ

মৌলে কারা ? কী তাদের পরিচয় ? এ নিয়ে নানা মতানৈক্য রয়েছে। পূর্ব মৌলে জাতি বলে কিছু ছিলকিনা, তা সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। বর্তমানেও মৌলে জাতি বলে কিছু নেই। কাজের ভিত্তিতেই এদের এই ধরনের নামকরণ। মধু সংগ্রহ কাজের সঙ্গে যারাই যুক্ত তারাই মৌলে। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই এই পেশায় যুক্ত হতে দেখা যায়। যারাই বৈধপাশ নিয়ে জঙ্গলে যায় সরকারী খাতায় তারাই মৌলে বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে যাদের জমি-জমা থাকেনা তারাই জঙ্গলের কাঠ, মধু, কাঁকড়া, মাছ, মীণ, প্রভৃতি বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। যে ব্যক্তি এ বছর মধু সংগ্রহ করতে যাচ্ছে, সে আগামী বছর মধু সংগ্রহ করতে নাও যেতে পারে। ফলে এ কথা বললে অন্যায় হবেনা যে, যারা প্রতি বছর মধুর সময়ানুযায়ী জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে যায় তারাই মৌলে। মৌলেদের কোন জাত হয়না। যারা মধু সংগ্রহ করতে যায়, তাদের জঙ্গল সম্পর্কে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা থাকার কারণে তাদেরকেই প্রতিবছর মধু সংগ্রহ করতে যেতে দেখা যায়। যারা জঙ্গলে যায় তাদের মধ্যে জঙ্গলকে কেন্দ্র করে কিছু লোকবিশ্বাস-সংস্কার গড়ে ওঠে, তেমনই এই মৌলেদের মধ্যেও কিছু লোকবিশ্বাস-সংস্কার রয়েছে। কি হিন্দু কি মুসলমান- উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা সেই বিশ্বাস-সংস্কার অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে। এদের বিশ্বাস-সংস্কারও প্রায় এক। আবার কখনো কখনো এক একটি মৌলে দলে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককে থাকতে দেখা যায়।

মৌলেদের জঙ্গলকেন্দ্রিক লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

মৌলেরা জঙ্গলে যায় ও মধু সংগ্রহ করে আনে, আপেক্ষিকভাবে বিষয়টি খুব সহজ সরল মনে হলেও তা আসলে খুবই কষ্টকর। অনবরত পিছনে পিছনে ধেয়ে চলে বিপদের আশঙ্কা। একটু অসতর্ক হলেই, হয় বাঘের পেটে নয়তো বিষধর সাপের কামড় খাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর সে সাপে একবার কামড়ালে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত। কারণ সুন্দরবনের গভীর জঙ্গল থেকে তাকে ফিরিয়ে এনে চিকিৎসা করানো প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। আর এসব বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা কিছু নিয়ম-রীতি পালন করে চলে। তারা বিশ্বাস করে এতে মা বনবিবি খুশী থাকেন; আর যদি কোন বিপদ আসেও তাহলে মা বনবিবি অলক্ষ্যে থেকে তাদের সতর্ক করে দেবেন। জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তারা যে নিয়ম-রীতি পালন করে থাকে তার কয়েকটি পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হল:

- ❖ সাধারণত অমাবস্যা বা পূর্ণিমার দু-তিন দিন পূর্বে জঙ্গলে যাওয়ার দিন নির্ধারণ করা হয়। মৌলেরা মনে করে এই সময় জঙ্গলে গেলে মধু বেশি পাওয়া যায়।
- ❖ যে দিন তারা জঙ্গলে যায় তার পূর্বের দিন রাতে স্বামী-স্ত্রী একসাথে ঘুমায় না। তারা মনে করে সহবাসের ফলে সে অপবিত্র হবে এবং অপবিত্র শরীর নিয়ে সে মায়ের কাছে অর্থাৎ মা বনবিবির কাছে যাবে। এতে মা বনবিবি ক্রুদ্ধ হতে পারেন।
- ❖ যে দিন তারা জঙ্গলে যায় সেদিন সকালেই মা বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজো দেয়। ঐ দিন ওরা কলা খায় না। যখন সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি থেকে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে, তখন কেউ ওদের পিছন থেকে ডাকেনা। তাছাড়া ঘর থেকে বেরোনোর সময় মৌলেরা কখনো পিছন ফিরে তাকায় না।

- ❖ নৌকো জঙ্গল মুখী হবার পূর্বে মা গঙ্গা দেবীর উদ্দেশ্যে ধূপ-ধুনো দিয়ে পুজো করে, কাঁসর শঙ্খ বাজায়।
- ❖ যারা জঙ্গলে যায় তারা যতদিন না ফিরে আসে ততদিন পর্যন্ত পরিবারের লোকজন অশৌচ রীতি পালন করে। স্ত্রীরা মাথায় তেল দেয় না, কপালে সিঁদুর দেয় না। বাড়িতে মাছ মাংস রান্না হয় না।
- ❖ যারা জঙ্গলে যায় তারা সর্বক্ষণ মা বনবিবিকে স্মরণ করে। সকাল সন্ধ্যা মা বনবিবির পুজো করে, আর সে পুজোর প্রসাদ হিসেবে মধুই নিবেদিত হয়।
- ❖ জঙ্গলে থাকা কালীন কোন মৌলে সরাসরি মাটিতে মল-মূত্র ত্যাগ করে না। গাছের ডালপালা ভেঙে তা মাটিতে রেখে তাতেই মলমূত্র ত্যাগ করে। সরাসরি মাটিতে মলমূত্র ত্যাগ করাকে তারা ঘোর অন্যায় বলে মনে করে। তাদের বিশ্বাস এতে মা বনবিবি অপবিত্র হন ও অসন্তুষ্ট হন। কোন মৌলে জঙ্গলে বা জঙ্গলের বাইরে কখনোই বাঘ শব্দটি উচ্চারণ করে না। তারা বাঘকে 'বাবু', আর জঙ্গলকে 'বাগান' বলে।
- ❖ জঙ্গলে গিয়ে যে স্থানটিতে নৌকো রাখার সিদ্ধান্ত নেয় সেখানকার পরিবেশ যদি তাদের গা-ছমছমে (খুবই নীরব) বলে মনে হয় তবে সেখানে মৌলেরা নৌকো রাখে না। আবার অনেক সময় নৌকো ডাঙায় থাকা সত্যেও কেঁপে উঠলে বা অকারণে নৌকোর মধ্যে শব্দ হলে তারা মনে করে মা বনবিবি তাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং স্থান ত্যাগ করতে বলছেন। ঐ অবস্থায় মৌলেরা খুব তাড়াতাড়ি ঐ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। কারণ তারা দেখেছে ঐ রকম সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে যারা থেকে গেছে তাদের বিপদ হয়েছে।
- ❖ এছাড়া মৌলেরা যদি জঙ্গলের মধ্যে কোন অপরিচিত বা অচেনা আওয়াজ পায়, যদি সামান্যতম বিপদ বা কাজের বিভ্রাট ঘটে তবে তারা মনে করে মা বনবিবি তাদেরকে সতর্ক করছেন। ঐ অবস্থায় মৌলেরা যতই মৌচাক দেখুক না কেন মধু সংগ্রহ না করে অন্যত্র চলে যায়।
- ❖ আবার কখনো যদি ঘুমের মধ্যে কেউ কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে, তবে সে তৎক্ষণাৎ সবাইকে তা জানায়। তার পর সবাই মিলে ঠিক করে ঐস্থানে আর থাকা উচিৎ কিনা। অনেক সময় তারা দেখেছে তাদের স্বপ্ন সত্যি হয়ে যায়। মা বনবিবিই নাকি বিপদের পূর্বে স্বপ্নাদেশে সব কিছু বলে দেন। আবার কখনো কখনো মা বনবিবি তাদের স্বপ্নাদেশ করে বলে দেন, তারা কোথায় গেলে ভালো মধু পাবে। তবে মা বনবিবি সবাইকে স্বপ্নাদেশ করেণ না। যারা খুব সৎ, যারা সব সময় মায়ের পুজো করে তারাই স্বপ্নাদেশ পায়।
- ❖ সব ঠিকঠাক হলে এবং যথেষ্ট পরিমাণ মধু পেলে তারা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে। অনেক সময় বেশি মধু পেলেও তারা জঙ্গলে থাকেনা। তারা মনে করে মা বনবিবি তাদের মধুর লোভ দেখিয়ে তাদের যাচাই করছেন। মৌলেরা বিশ্বাস করে বেশি লোভাতুর হলে তাদের বিপদ ঘটতে পারে।
- ❖ জঙ্গল থেকে যখন তারা সম্পূর্ণভাবে বেরিয়ে আসে তখন জঙ্গলের একটা উঁচু স্থানে একটু পরিষ্কার করে সেখানে মাটি দিয়ে লেপে মা বনবিবির উদ্দেশ্যে পুজো করে এবং জঙ্গল থেকে আহরিত মধুর কিছুটা বনবিবির জন্য রেখে আসে। একই সঙ্গে তারা এও মানত করে আসে পরের বার এলে যদি আরো বেশি মধু পায় তবে আরো বেশি করে মা বনবিবির পূজো করবে।
- ❖ যখন তারা বাড়ি ফেরার জন্য নৌকোতে ওঠে তখন নৌকোর চন্ডীতে (নৌকোর মাথায় সিঁদুর দেওয়া অংশ) মধু ঢেলে দেয় এবং এমন ভাবে ঢালে যাতে মধু গড়িয়ে পড়ে, এতে তারা মনে করে আবার যদি তারা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে আসে তবে এতো মধু পাবে যে, তাদের মধু রাখার পাত্র এমনি ভাবে উপচে পড়বে।
- ❖ অনেক সময় মা বনবিবির বাহন বাঘকে খুশী করবার জন্য বাড়ি থেকে মানত করে মুরগী নিয়ে যায়। সব ঠিক ঠাক হলে ফেরার সময় ঐ মানত করা মুরগী বাঘের জন্য জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসে।

তাদের এ সমস্ত লোকবিশ্বাস-সংস্কার একদিনে তৈরি হয়নি। আর এই বিষয়গুলিকে নিতান্তই বিশ্বাস সংস্কারের চোখে দেখলে হবে না। এর মধ্যে রয়েছে বংশ-পরম্পরা লব্ধ জ্ঞান, যা দীর্ঘ দিন ধরে ঐ পেশার মানুষরা জঙ্গলে গিয়ে নিজেদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছে। তারা দেখেছে, তারা যদি বিষয়গুলোকে না মানে তবে তাদের বিপদ হয়। এর মধ্যে হয়তো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। তবে সে যাই হোক জঙ্গলের মধ্যে, মৌলেরা তাদের এই বিশ্বাস-সংস্কারগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলে।

মৌলেসমাজ: আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত ও অবস্থান :

মৌলে কারা? কী তাদের সামাজিক পরিচয়? তা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণভাবে মনে হয় অর্থনৈতিক দারিদ্রতাই তাদের মৌলে করে তুলেছে, তাদেরকে জঙ্গলে গিয়ে মধু সংগ্রহ করতে বাধ্য করেছে। কারণ, যারা মধু সংগ্রহ করতে যায় তাদের অনেকেরই চাষযোগ্য জমি নেই। তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। যৌথ পরিবার এখন কোথাও খুব একটা দেখা যায় না। বাড়ির ছেলেদের বিবাহ হবার পর যখন তারা স্বতন্ত্র পরিবার গঠন করতে চায় তখন নিজেদের মধ্যে সম্পত্তির বন্টন হয়। তাতে এক এক জনের ভাগে এমনই জমির অংশ পড়ে যে, সেখানে নিজেদের ঘরটুকু তৈরি করতে পারে না। তখন বাধ্য হয়েই নদী বাউন্ডারিতে (নদীর তীরবর্তী অঞ্চল) ঘর বানায়। জমি জমা হারিয়ে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে জঙ্গলের ওপর। যাদের আবার জমি রয়েছে ফি-বছরই নদীর বাঁধ ভেঙে জলাজমিতে নোনা জল ঢুকে পড়ে, ফলে সে জমি আর চাষ যোগ্য থাকে না। অভাব হয় এদের নিত্য সঙ্গী। ক্ষেত্রসমীক্ষায় পরিলক্ষিত হয়, নদীর তীর বরাবর যে স্থল ভাগ ব্যাক্তিমালিকানা নয় অর্থাৎ যাকে নদীর চর বলে; অনেক পরিবার সেখানে ঘর-বাড়ি বানিয়ে বাস করছে। জঙ্গলের ডাল-পালা দিয়ে বেড়া দেওয়া, খড়ের ছাউনির একটা ছোট ঘর ও হাতে গোনা কয়েকটা বাসন পত্রই তাদের একমাত্র সম্বল। এদের সারা বছরই নদীর মাছ, কাঁকড়া জঙ্গলের কাঠ, মধু প্রভৃতি ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। বছরের কয়েকটা মাস যখন জঙ্গলের গাছে (বানি, খলসে, কাঁকড়া, গরাণ, হেতাল, গামা, কেওড়া) ফুল ফোটে তখন আর এরা ঘরে বসে থাকতে পারে না। এই কয়েক মাসেই তাদের একটু বেশি রোজগারের সুযোগ থাকে। দলবদ্ধভাবে বেরিয়ে পড়ে মধু সংগ্রহের কাজে। এক এক বারে যে পরিমাণ মধু সংগৃহীত হয়, তা দলের লোকসংখ্যা ও একটি অতিরিক্ত (যদি দলে ৭ জন থাকে তবে ৭+১ = ৮ টি) সমান ভাগে ভাগ করা হয়। মধু সংগ্রহের ক্ষেত্রে যার নৌকো ব্যবহার করা হয় সে ঐ এক ভাগ বেশি পায়। সব বছর আবার সমান মধু হয় না। যে বছর মধু বেশি হয় সে বছর আবার বনবিভাগ মধু কিনতে চায় না। মধু কিনলেও দাম এতটাই কম থাকে যে তাতে বিশেষ লাভ থাকে না। ফলে অনেক সময়ই তাদের সংগৃহীত মধু বিক্রি হয় না। এ তো গেল মধু সংক্রান্ত সমস্যা, এছাড়াও বনবিভাগের অত্যাচার তো রয়েছেই। প্রায়শই কোন কারণ ছাড়াই বনবিভাগ কর্তৃক মৌলেরা অত্যাচারিত হয়। কখন কখন তারা বিনা কারণে গ্রেপ্তার হয়, তখন টাকা-পয়সা, সংগৃহীত মধু দিয়ে তাদের নিজেদের ছাড়িয়ে আসতে হয়। তাদের অত্যাচারিত হবার কারণ একটাই তারা লেখা-পড়া জানে না; পুলিশকে তারা ভয় পায়। এত সমস্যার মধ্যেও তারা ফি-বছর জঙ্গলে যায়, স্বাচ্ছন্দে থাকার জন্য; কিছু রোজগারের আশায়। কিন্তু দারিদ্রতাকে তারা কাটিয়ে উঠতে পারছে না। পুষ্টির অভাব, হাড় বের হওয়া জীর্ণ শরীর, পরনে ছেড়া জামা কাপড়; এমন চিত্র মৌলেদের ঘরে ঘরে। তারা আজ সমাজের অনেক পিছিয়েপড়া মানুষ। তদের কথা ভাববার মানুষ খুবই কমই রয়েছে।

মৌলেদের জীবিকাকেন্দ্রিক কিছু সমস্যা ও তার সমাধানের পথ

মৌলেরা দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলে যাচ্ছে মধু সংগ্রহ করতে। কতলোক নিখোঁজ হয়েছে তার হিসেব আমরা জানি না। কত পরিবার হারিয়েছে তাদের স্বামী, পুত্র, পরিজনদের তার পরিসংখ্যানও আমাদের কাছে নেই। মৌলেরা যে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভালো রয়েছে তা কিন্তু নয়। আজ তারা প্রতিনিয়ত নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, যা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে:

- তাদের জঙ্গলে যাওয়ার জন্য উপযুক্ত পোশাক নেই। সেই সঙ্গে নেই তাদের বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপকরণ।
- জঙ্গলে যাওয়ার বৈধ পাশ তারা সব সময় পায় না। বৈধ পাশ পেতে হলে তাদের অনেক নিয়ম-কানুন মানতে হয়, যা মৌলেদের পক্ষে অনেক সময় অসম্ভব হয়ে ওঠে।
- জঙ্গলে যাওয়ার জন্য তাদের ১০-১৫ দিনের রসদের প্রয়োজন হয়; প্রয়োজন হয় বড় নৌকার, যা জোগার করা মৌলেদের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার। ফলে অনেক সময়ই তারা গভীর জঙ্গলে যেতে পারে না। পর্যাপ্ত মধু সংগ্রহ না করেই তাদের ঘরে ফিরে আসতে হয়। এতে তাদের ক্ষতি হয়।
- সংগৃহীত মধুর যথাযথ বিপণনের ব্যবস্থার অভাব রয়েছে, যা তারা প্রতি নিয়ত অনুভব করে। অনেক সময় সংগৃহীত মধু বিক্রি করতে পারে না। এর ফলে মৌলেদেরকে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।
- সুন্দরবন অঞ্চলের মৌলেরা প্রায়ই জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। জলদস্যুরা মৌলেদেরকে পণবন্দী করে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোক-জনদের প্রচুর টাকার বিনিময়ে পরিজনদের ছাড়িয়ে আনতে হয়।

প্রভৃতি সমস্যাগুলি তাদের জীবন-যাপন তথা জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

সমস্যা সমাধানের কয়েকটি পথ

এমনই সব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে আজকের মৌলেরা। যদি সরকার কর্তৃপক্ষ তথা আমরা এ বিষয়ে সচেতন হই, তবে মৌলেদের এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। যেমন-

- বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তাদের যদি এমন পোশাক তৈরি করে দেওয়া যায়, যার সাহায্যে তারা মৌপোকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারবে, পায়ে যদি জঙ্গলের কাঁটা না ফোটে, যদি বাঘের আক্রমণ থেকে সে পোশাক মৌলেদের রক্ষা করতে পারে, তবে তারা অনেকটাই উপকৃত হতে পারে।
- জঙ্গলে যাওয়ার বৈধ পাশ সংগ্রহে যদি শিথিলতা আনা যায় তবে মৌলেরা উপকৃত হয়।
- সরকারীভাবে তাদের যদি লোন বা আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে মৌলেদের মধু সংগ্রহ করতে সুবিধা হয়।
- যদি সরকার উদ্যোগী হয়ে মধু বিপণনের খুব ভাল ব্যবস্থা করতে পারে, তাহলে মৌলেদের মধুসংগ্রহে উৎসাহ বৃদ্ধ পাবে।
- এ ক্ষেত্রে যদি বেসরকারী কোন সংস্থা মৌলেদের কাছ থেকে সরাসরি মধু সংগ্রহ করবার সুযোগ পায় তাহলে মধুর বিপণন অনেকটাই বৃদ্ধি পাবে। মৌলেদের অর্থনৈতিক দিক কিছুটা হলেও উন্নত হবে।

এমন সব সমস্যা সমাধানের পথে যদি সরকার বা বেসরকারী সংস্থা বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে তাহলে, মৌলেদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকের অনেক সমস্যার সমাধান ঘটানো যেতে পারে।

উপসংহার

সুন্দরবন আজ World Heritage Site। কিন্তু সেই সুন্দরবনের উন্নতির যথার্থ পরিকল্পনা হচ্ছে কি ? যারা সুন্দরবনের নানা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে তাদের কথা আজ ক'জন ভাবছেন? সুন্দরবন অঞ্চল থেকে যে পরিমাণে মাছ, কাঁকড়া সংগৃহীত হয় সে পরিমাণে অন্য বিষয়গুলি সংগ্রহের কোন পরিকল্পনা হচ্ছে কি? যদি তাই হত তবে সুন্দরবনের যে সমস্ত লোকেরা মধু সংগ্রহ পেশার সাথে যুক্ত রয়েছে, তারা অর্থনৈতিক দিক থেকে এমন পিছিয়ে পড়ত না। যে পরিমাণে সুন্দরবনে মধু উৎপাদন হয় তার সবটা যেমন সংগৃহীত হয় না, তেমনি যা সংগৃহীত হয় তার যথা যথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেই। নানা কারণে তার অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। মধুর গুণাগুণ সম্পর্কে আজ আমরা সচেতন। যদি সুন্দরবন থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ মধু সংগ্রহ করা যেত, তাহলে বোধহয় মৌলেরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছুটা হলেও সচ্ছল থাকত। এছাড়াও জলদস্যুদের সমস্যাতো রয়েছেই। আবার কখনও কখনও মৌলেরা এত পরিমাণে মধু সংগ্রহ করে ফেলে যে, তা বিক্রি করবার জায়গা থাকে না। ফলে মূল্যবান মধু সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। এমনই অজস্র সমস্যার সম্মুখিন হয়ে মৌলেরা তাদের পেশা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। তারা ক্রমাগত মধুসংগ্রহে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ছে। মৌলে সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা সংকটহীন করার জন্য প্রয়োজন সরকারী ও বেসরকারী সহায়তা ও উন্নয়নমুখী উদ্যোগ। তা না হলে তাদের জীবন ও জীবিকা সংশ্লিষ্ট সুন্দরবন কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বিশেষত্ব বিনষ্ট হবে।

তথ্যসূত্র

১.নস্কর, ধূর্জটি, 'সুন্দরবন সভ্যতার ইতিহাস',সুন্দরবনের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০০, পৃ.- ৬৪।
মিস্ত্রী, সুভাষ, দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজের মন্ত্র, কলকাতা, ২০০০, পৃ.- ১৯।

তথ্যদাতা

ক্ষেত্রসমীক্ষা: তাং-০৯.০৬.১০১৫, তথ্যদাতার নাম-মহাদেব মণ্ডল, গ্রাম-দেবিপুর, পোষ্ট-দেবিপুর, থানা-কুলতলি, জেলা-দ: ২৪ পরগণা, পেশা-মধু সংগ্রহ, বয়স- ৪৫বছর।
ক্ষেত্রসমীক্ষা: তাং-১০.০৬.১০১৫, তথ্যদাতার নাম-শ্রীপতি মণ্ডল, গ্রাম-ভূবনেশ্বরী,পোস্ট-ভুবনেশ্বরী, থানা-মৈপিঠ(কোষ্টাল), জেলা-দ: ২৪ পরগণা, পেশা-মধু সংগ্রহ, বয়স- ৩০ বছর।
ক্ষেত্রসমীক্ষা: তাং-১১.০৬.১০১৫, তথ্যদাতার নাম-বরুণ মণ্ডল, গ্রাম-ভাসা গুড়গুড়িয়া, পোষ্ট-দেবিপুর, থানা-মৈপিঠ(কোষ্টাল), জেলা-দ: ২৪ পরগণা, পেশা-মধু সংগ্রহ, বয়স- ৩২ বছর।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, রাজীব, সুন্দরবনের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), গতিধারা পাবলিকেশান, ঢাকা, ২০১২।
আবদুল জলিল, এ.এফ.এম, সুন্দরবনের ইতিহাস, কলকাতা, ২০০০।
মিস্ত্রী, সুভাষ, দক্ষিণবঙ্গের লোকসমাজের মন্ত্র, কলকাতা, ২০০০।
মিত্র, শিবশঙ্কর, 'সুন্দরবন সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

পত্র-পত্রিকা

নস্কর, কুমুদ রঞ্জন, 'সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ অরণ্য ও আমরা', সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, কলকাতা, ২০০২।
মণ্ডল ইসলাম, নাজিবুল(সম্পা), 'সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা', সমকালের জিয়নকাঠি সাহিত্য পত্রিকা, কলকাতা।
মণ্ডল ইসলাম, নাজিবুল(সম্পা), 'সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা', সমকালের জিয়নকাঠি (দ্বিতীয় খণ্ড), কলকাতা, ২০০৮।

ওয়েবসাইট

http://www.academia.edu/7272176/Moule_honey_collectors_of_Sundarbans_and_their_ITKs_by_Kalyan_Chakraborti_Monanjali. Date-12.02.2015

http://www.bbc.com/news/13556336. Date-12.02.2015

http://www.ri.org/files/uploads/Media%20Coveage%20-%20SESTS-%20Independent.pdf. Date- 12.02.2015

http://sundarbannews.blogspot.in/2015/02/honey-collection-season-begins.html. Date- 13.03.2015

http://www.isca.in/IJSS/Archive/v2/i6/2.ISCA-IRJSS-2013-069.pdf. Date- 30.04.2015

https://lindapluto.wordpress.com/2013/06/02/the-story-of-a-honey-collector-in-sundarbans. Date- 20.05.2015